ষষ্ঠ সংখ্যা, ২০১১

আলোকচিত্রম্

প্রকাশনায়
ছায়াপথ

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা ২

অন্ধকার ঘরের (Dark Room) রোমাঞ্চ ৩
অমিতাভ শীল

ফোটোগ্রাফির গোড়ার কথা ৫
অশোক কুমার সান্যাল

আলোকচিত্রের সেকাল ও একাল ৭
ধ্রুব দত্ত

গল্পের ছবি, ছবির গল্প ৯
গৌতম মিত্র

আলোকচিত্রের কথকতা ১১
প্রণব কুমার রায়

আলোকচিত্রের বিচার ১৩
সুধাময় ঘোষাল

আমাদের লক্ষ্য ১৬

সম্পাদকের কথা

সবাইকে জানাই নতুন বছরের শুভেচ্ছা।

অনেক প্রতীক্ষা অনেক আশঙ্কার অবসান ঘটিয়ে 'আলোকচিত্রম' পুনঃপ্রকাশিত হল দীর্ঘ দুই দশক পর। পঁচিশে বৈশাখের এই পূন্য প্রভাতটিই এই প্রকাশের যথার্থ সময়। দুরঅতীতের এই রকম একটি দিনেই প্রতিষ্ঠাতা সদস্যেরা একত্র হয়েছিলেন 'ছায়াপথ' গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে।

প্রকাশ বন্ধ হবার সময়ে আমরা যারা নবীন ছিলাম তাদের অনেক স্বপ্নের মধ্যে অন্যতম ছিল আলোকচিত্রম-এর পুনরুজ্জীবন। সেই কাজ আজ সফল। এই আনন্দ যজ্ঞের সমিধ হতে পারায় আমি গর্বিত। যাঁরা প্রকাশের এই দায়িত্ব নিয়ে অনলস পরিশ্রম করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ। আমি স্থিরনিশ্চিত, ছায়াপথ-এর সমস্ত সদস্যরাই খুশি হবেন এই পুনঃপ্রকাশে।

এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তন ঘটেছে অনেক, ফোটোগ্রাফির জগতে ঘটে গেছে যুগান্তর। সামগ্রিক পরিবর্তনের সাথে তাল রেখে পত্রিকার কলেবর ও রূপ-এর বদল করতে হয়েছে, যেটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিন্তু পরিবর্তন হয়নি এর চরিত্রের, উদ্দেশ্যর। ফোটোগ্রাফির মতো আধুনিক শিল্প মাধ্যমটির জ্ঞান এবং তার প্রসারের যে লক্ষ্য নিয়ে আলোকচিত্রম হাঁটি হাঁটি পা-পা করে আমার পূর্বসুরীদের হাত ধরে যাত্রা শুরু করেছিল আজও সেই লক্ষ্যে রয়েছে অবিচলিত। আজকের যুগে, যেখানে বিশ্বের জ্ঞান ভান্ডার উন্মুক্ত হবার আগ্রহে একটি ক্লিক-এর অপেক্ষায়, সেখানে আমার আশা এবং বিশ্বাস অলোকচিত্রম প্রত্যেকের লব্ধ জ্ঞানের পারস্পারিক আদান প্রদানের এক মহা-মিলনক্ষেত্র বলে বিবেচিত হবে।

আলোকচিত্রম ছায়াপথের শিল্পী মনের কর্মযজ্ঞের মহাঙ্গন। আমাদের সম্মিলিত উদ্দেশ্য হোক একে তপোবনের পবিত্রতায় রূপ দেওয়া। সমস্ত মালিন্য থেকে রক্ষা করে নির্মল জ্ঞানের আধার করে তোলা।

আলোকচিত্রম দীর্ঘজীবি হোক।

২৫ বৈশাখ ১৪১৮ (9th May 2011)
কলকাতা - ৭০০০২৬

অন্ধকার ঘরের (Dark Room) রোমাঞ্চ

অমিতাভ শীল
F.FIP; A.RPS; E.FIAP; Hon.FIP; A.IIPC; Hon.F.Cos.

আমি ছবি তুলতে শুরু করি ১৯৭৩ সালে ক্লিক-৩ ক্যামেরায়। ১৯৮০ সাল থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা শুরু করি। ঐ বছরেই Pentax K1000 ক্যামেরা কিনি এবং আমার পড়ার ঘরটিকে অন্ধকার ঘরে (Dark Room) রূপান্তরিত করি।

ফিল্ম ডেভেলপমেন্টের সময় ঘর পুরো অন্ধকার করে ফিল্মটিকে ডেভেলপিং ট্যাঙ্কে ঢোকাতে হত। যেহেতু সেফ লাইটে ফিল্ম সেনসেটিভ, তাই ঘর পুরো অন্ধকার করে ফিল্মটিকে ট্যাঙ্কে ঢোকাতে হত। প্রথমদিকে দিনের আলোয় একটি নষ্ট হয়ে যাওয়া ফিল্ম নিয়ে ডেভেলপিং ট্যাঙ্কে ঢোকানো অভ্যাস করতে হত। পরে অন্ধকার ঘরে এক্সপোজড ফিল্মটিকে ঢোকাতে হত। এক্সপোজড ফিল্মটিকে অন্ধকার ঘরে ট্যাঙ্কে ঢুকিয়ে তারপর দিনের আলোয় ডেভেলপ করা হত। কেননা ট্যাঙ্কের উপর থেকে ডেভেলপার ঢুকতে পারে, বেরোতে পারে কিন্তু অলো ঢুকতে পারবে না। যে আলো আমরা দেখতে পাই (visible light), সেটি ডেভেলপিং ট্যাঙ্ক ভেদ করে ভিতরে ঢুকতে পারে না। কিন্তু যে আলো আমরা দেখতে পাই না অর্থাৎ ইনফ্রারেড আলো কিন্তু সাধারণ ডেভেলপিং ট্যাঙ্ক ভেদ করে ঢুকতে পারে। তাই যখন ইনফ্রারেড ফিল্ম ডেভেলপ করতাম তখন ফিল্মটিকে ট্যাঙ্কে ঢোকানো থেকে ফিক্সিং করা পর্যন্ত পুরোটাই অন্ধকার ঘরে করতে হত।

যেহেতু ফটোগ্রাফিক পেপার ঘন লাল রঙে সেনসেটিভ নয়, তাই প্রিন্ট করার সময় সেফ লাইট (ঘন লাল রঙের) জ্বালিয়ে প্রিন্ট করা যায়। ঘর পুরো অন্ধকার করার দরকার হয় না। জিরো পাওয়ারের ঘন লাল রঙের আলোয় ডার্করুমে একটা অদ্ভুত মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। জীবনের প্রথম যেদিন ডার্করুমে প্রিন্ট করেছিলাম (১৯৮০ সাল, দিনটা মনে নেই), সেদিনের কথা মনে পড়লে মনটা এখনও রোমাঞ্চিত হয়। এনলার্জারে সাদা পেপারের উপর এক্সপোজার দেবার পর সাদা পেপারের আপাত দৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। সাদা পেপারটিকে ডেভেলপারে দেবার কয়েক সেকেন্ড পর থেকে ম্যাজিকের মতো সাদা পেপারে আস্তে আস্তে ছবি আসতে শুরু করে। এ এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অনুভূতি।

যারা নতুন ফটোগ্রাফি শুরু করেছেন তারা এই রসে বঞ্চিত। কেননা এখনকার দিনে নতুন ফটোগ্রাফাররা কেউই ডার্করুমে কাজ করেন না। এখন সকলেই ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তুলে কমপিউটারে ছবি তৈরী করে নিচ্ছেন।

এনলার্জারের মাধ্যমে সাদা পেপারে একবার এক্সপোজার দেবার পর ফিক্সিং হয়ে গেলে, আর এক্সপোজার কমানো বা বাড়ানো যায় না। ভুল এক্সপোজার দিলে পেপার নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু কম্পিউটারে ফটোশপের মাধ্যমে ছবি করার পর যদি মনে হয় ছবি ঠিক হয়নি তাহলে আবার পিছিয়ে গিয়ে অর্থাৎ UNDO করে আবার ছবি ঠিক করা যেতে পারে-এর জন্য কোনও খরচা হয় না—যেটা একটা বিরাট সুবিধা এই মাধ্যমের।

আগে একটা সঠিক 15” x 12” প্রিন্ট করার পর আমরা জোর দিয়ে বলতে পারতাম না যে একেবারে ঠিক একই রকম প্রিন্ট আবার করা যাবে কি না। কেন না এনলার্জারের মাধ্যমে এক্সপোজার দেবার পর হাতের সাহায্যে যে ডজিং, বার্ণিং করা হত সেগুলি একটা প্রিন্টের সাথে অন্যটার একটু আধটু কম বেশি হতই। কিন্তু কম্পিউটারে ফটোশপের মাধ্যমে যে ছবিটিকে একবার ঠিক করা হয় সেটিকে সেভ করে রাখলে বার বার একই ধরণের ছবি প্রিন্ট করা যাবে যদি যে কম্পিউটারে ছবি করা হয়েছে তার সাথে যেখানে প্রিন্ট করাবেন সেখানকার কম্পুউটারের এর সাথে ক্যালিব্রেশন ঠিক থাকে।

ডার্করুমে দীর্ঘদিন কাজ করেছি, বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতাও হয়েছে। কিন্তু একদিনের একটা ঘটনার কথা এখনও মনে আছে। ১৯৮০ সাল থেকে আমি নিজের ডার্করুমে নিজেই প্রিন্ট করা শুরু করেছিলাম। তখন 15" x 12" প্রিন্ট Agfa পেপারে করতাম। দশটি পেপারের প্যাকেটের দাম ছিল ৪৪ টাকা।

১৯৮৩ সালে ডিসেম্বর মাসে আমার এক খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু, প্রদীপের বাবা মারা যান। উনি খুবই মিশুকে ভদ্রলোক ছিলেন। আমাদের সাথে বন্ধুর মতো মিশতেন। দুদিন বাদে প্রদীপ আমাকে ওর বাবার একটা নেগেটিভ দিয়ে একটা বড়ো প্রিন্ট করে দিতে বলেছিল শ্রাদ্ধের দিনের জন্য।

তখন আমি প্রিন্ট করতাম রাত্রে খাওয়ার পরে। বিয়ের আগে তিনতলায় আমি একাই থাকতাম। ডার্করুমে প্রিন্ট করার পর সাধারণত রাত দুটো নাগাদ শুতে যেতাম। সেদিনও অন্যান্য দিনের মতো রাত্রের খাবার পর এনলার্জারের মধ্যে প্রদীপের বাবার নেগেটিভ ঢুকিয়ে এক্সপোজার দিয়েছিলাম। তারপর সাদা পেপারটা ডেভলপারে চোবানোর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে প্রদীপের বাবার হাসি খুশি মুখের ছবি ফুটে উঠতে শুরু করল। মনে হল উনি হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন আর জিজ্ঞেস করছেন, 'কিরে কখন এলি?' নিশুতি রাতে অন্ধকার ডার্করুমে সাম্যন্য ঘন লাল রঙের আলোয় নিজের ছায়া দেখলেই মাঝে মাঝে চমকে যাই, মনে হয় অন্য কেউ আমার সাথে রয়েছে ডার্করুমে। এই রকম মোহময় অথচ ভৌতিক পরিবেশে আমি ওঁর চাউনি সহ্য করতে পারিনি। মুহূর্তের মধ্যে ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। পেপারটা আলো লেগে পুরো কালো হয়ে গিয়েছিল, কেননা ঘরের আলো জ্বালাবার আগে ফিক্সিং করা হয়নি বলে। সেদিন আর প্রিন্ট করতে পারিনি। পরের দিন প্রদীপকে সঙ্গে নিয়ে প্রিন্ট করলাম। সেদিনের প্রিন্টটা বেশ ভালোই হয়েছিল।

ডার্করুমে ঘন্টার পর ঘন্টা কাজ করা বেশ কষ্টের। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই কায়িক পরিশ্রমটা আর করতে ইচ্ছে করে না। আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি এইজন্য যে একটা সময়ে কায়িক প্ররিশ্রমের জন্য ডার্করুমে কাজ করা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ ফটোগ্রাফিটাই বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। আর ঠিক সেই সময়েই ফটোশপের মাধ্যমে কম্পুউটারের ছবি করা শুরু হওয়ার ফলে আমি আবার নতুন উদ্যমে ফটোগ্রাফি শুরু করি।

আমি দুটো মাধ্যমে কাজ করে দেখেছি, কম্পিউটারে কাজ করার অনেক সুবিধা, কায়িক পরিশ্রম নেই বললেই হয়। আর ডার্করুমে কাজ করার অনেক অসুবিধা—কায়িক পরিশ্রম অনেক বেশি জায়গা বেশি লাগে, খরচাও বেশি।

কিন্তু যখন পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে তখন মনে হয় যে শত অসুবিধার মধ্যেও ওই অল্প লাল আলোর মোহময় রোমাঞ্চকর পরিবেশে অন্ধকার ঘরে (ডার্করুম) কাজ করে যখন একটা সঠিক প্রিন্ট করতে পারতাম—তার যে আনন্দ, এখন কম্পিউটারের মাধ্যমে কাজ করে ঠিক সেই রোমাঞ্চকর অনুভূতিটা যেন হয় না। ওটা এখন হারিয়ে গেছে ইতিহাসের পাতায়।

ফোটোগ্রাফির গোড়ার কথা

অশোক কুমার সান্যাল
A.FIP; A.FIAP.

।। ভূমিকা।।

অনেকদিন আগে আলোকসংবেদী পদার্থ আবিস্কারের তত্ত্ব ও তথ্যের অনুসন্ধানে রত আমার হাতে আসে দুটি ইংরেজী বই। বইদুটিতে পড়া এই আবিস্কারের কাহিনী আমার কাছে খুবই চিত্তাকর্ষক মনে হয়। ১৮১৬ থেকে সিলভার ভিত্তিক আলোক সংবেদী পদার্থের বিকাশ এবং বিবর্তন হয়ে ব্যবহারিক রোল ফিল্ম পর্যন্ত পৌঁছান এবং ফোটোগ্রাফির জনসাধারণের শিল্প মাধ্যমে পরিণত হওয়ার পিছনে কেবলমাত্র বিজ্ঞানী নয়, শিল্পী, মুদ্রাকর, সৈনিক, সংগীতজ্ঞ, অভিজাত এমনকি পূরোহিত অর্থাৎ বিভিন্ন পেশা এবং নেশার বহুলোকের অবিস্মরণীয় অবদানকে গল্প বলে মনে হবে। আমি এই ঘটনার বাংলা ভাষান্তর শুরু করি এই ভেবে যে, যদি সুযোগ আসে আপনাদেরও এই গল্পের মতন সত্যঘটনা শোনাতে পারি। আলোকচিত্রম-এর সৌজন্যে সে সুযোগ এসেছে। তাই নিবেদিত প্রাণ মানুষের সেই ত্যাগ, তিতীক্ষা, আশা, আশাভঙ্গ এবং সবশেষে অর্জিত সাফল্যের কথা শোনাব কয়েকটি পর্বে।

।। নিয়তি।।

১৮৪০ সালে বৃটিশ অঙ্কবিজ্ঞানী প্রফেসর জর্জ বুল যখন বললেন শুধুমাত্র শূণ্য এবং এক এই দুটি সংখ্যা দিয়ে পৃথিবীর তাবৎ আঙ্কিক সমস্যাতো বটেই, সমস্ত মানবিক অনুভূতি এমনকি যুক্তিবিজ্ঞানের মতো জটিল বিষয়ও প্রাঞ্জল ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব, তখন সিলভার বেসড্ ফোটোগ্রাফি নেহাৎই আঁতুড়ে ছেলে, বয়স এক ছুই ছুই। বূল সাহেবের কথাটা কিছু লোক শুনলো; অনেকেই শুনলো না। যারা শুনলো, আমল দিল না, সহজেই ভুলে গেল। কিন্তু নিয়তি! সে ভুললো না, সঠিক সময়ের অপেক্ষায় কাটিয়ে দিল একটা দুটো নয়, টানা দেড়শটা বছর।

তারপর কালের অমোঘ নিয়মে নিয়তির হাতে ঘুরে এল পাশার দান। নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে গেল সিলভার-বেসড্ ফোটোগ্রাফির জম-জমাট রাজত্বে। উঠলোনা কোনও রব, ক'রলনা কেউ হা-হুতাশ, রাজা-বদল হয়ে গেল বিনা অশ্রুপাতে। সবাই ছুট্‌ল নব কেতন হাতে উদ্বাহু, নতুন রাজার তোষামদে। নতুন রাজা! সে আবার কে? কেন, স্যর্ বূল-এর সেই পালিত জমজ, শূণ্য আর এক, সিলভার-বেসড্ ফোটোগ্রাফির দুই সৎ ভাই! যে কফিনটিতে স্যর্ বূল প্রথম পেরেকটি পুঁতেছিলেন, বহুজাতিয় সংস্থাগুলো তড়িঘড়ি সেই কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দিলেন। ব্যস, সিলভার-বেসড্ ফোটোগ্রাফির জমানার ইতি, তখ্‌তে উঠলেন ডিজিটাল ইমেজিং। তাঁর রাজত্বও তা' প্রায় দু'দশক হয়ে গেল। কায়েম হয়ে গেছে তাঁর শাসন। এখন তিনি অবিসংবাদী রাজা।

।। পাগল।।

১৮২৭ সালের এক বিকেল। ঐ সময়ের প্রথিতযশা কেমিষ্ট জ্যাঁ দ্যুমা (Jean Dumas) সরবোন (Sorbonne) -এ লেকচার সেরে বেরোতেই এক উদ্‌ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ালেন। মহিলা বললেন, 'আমি পেইন্টার দ্যুগের-এর স্ত্রী, শুনছেন, আমার স্বামীকে ভূতে ধরেছে! তার বদ্ধমূল ধারণা লেন্সের ভিতর দিয়ে চলমান জগতের যে প্রতিচ্ছবি হয় তা' সে চিরকালের জন্যে ধরে রাখতে পারবে। আপনি তো বিজ্ঞান জগতের লোক, বলুন এটা কি সম্ভব, না সত্যি সত্যিই সে পাগল হয়ে গেছে?'

প্রফেসর দ্যুমার মনে পড়ে গেল ঠিক একশ' বছর আগের ঘটনা। ১৭২৭ সালে জার্মানির চিকিৎসা বিজ্ঞানী এ্যল্‌টডর্‌ফ য়ুনিভারসিটির প্রফেসর হাইন্‌রিখ্ শুলৎজ-এর এই রকম ক্ষণস্থায়ী ছবিগুলোর কথা। ল্যাবরেটরীতে

পরীক্ষা নিরীক্ষা করতো গিয়ে শ্যুল্‌ৎজ লক্ষ্য করলেন সিলভার নাইট্রেট ভরা যে ফ্লাক্সটা কিছুক্ষণ আগে জানালার কাছে রেখেছিলেন সেই ফ্লাক্সটার যে অংশে সূর্যের আলো পড়েছে সেই অংশে সল্যুশন-এর রঙ ঘন বেগুনি হয়ে গেছে অথচ যে অংশে সূর্যের আলো লাগেনি সেখানে তার রঙ-এ কিছু পরবর্তন হয়নি। বোতলটা ঝাঁকিয়ে দিতেই সব সল্যুশন আবার অগের মতো হয়ে গেল। উৎসুক শ্যুল্‌ৎজ তখন বোতলটির গায়ে ষ্টেনসিল কাগজ মুড়ে রোদে রেখে দিলেন। এবার দেখা গেল ষ্টেনসিলের যে জায়গা দিয়ে বোতলের গায়ে আলো পড়েছে, ভিতরের সিলভার নাইট্রেট-এর রঙ সেই সেই জায়গায় ঘন কালো হয়ে গেছে আর যেখানে আলো পড়েনি সেখানে সল্যুশন-এর রঙ অপরিবর্তিত আছে। শ্যুল্‌ৎজ-এর চিন্তা হল এই পরিবর্তনের জন্য সূর্যের আলো অথবা উত্তাপ, কে দায়ী। তিনি এক বোতল সল্যুশন অন্ধকার গরম আভেন-এর মধ্যে রাখলেন, কিন্তু সেখানে কোনও পরিবর্তন নেই, তবে যেই ঐ বোতল ঘরের সাধারণ আলোতে রাখলেন অল্প সময়ের মধ্যেই ভিতরের প্রতিফলিত সূর্যালোক-এ সল্যুশন-এর রঙ-এ পরিবর্তন আসতে লাগলো। তাঁর মনে পড়ল সপ্তদশ শতাব্দীর (১৬১৪) ইতালীয় বিজ্ঞানী আন্‌জেলো সালা (Angelo Sala)-র কথা যিনি তাঁর ডায়েরিতে লিখে গিয়েছিলেন 'সিলভার নাইট্রেট পাউডার সুর্য্যের আলোতে রাখলে কালো হয়ে যায়, তা' দিয়ে ছবি করা সম্ভব কিন্তু সে ছবি হবে অস্থায়ী'। তিনি বিভিন্ন রঙএর আলোকসংবেদীতা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তাঁর আবিস্কার অর্থাৎ সিল্‌ভার সল্যুশন্‌কে আরও সেনসিটিভ করা অথবা ওই ইমেজগুলোকে স্থায়ী করার কোনও প্রয়াস করেননি। প্রফেসর দ্যুমা জানতেন ছবিকে স্থায়ী (fix) করার কৌশল তখন-ও বিজ্ঞানীদের অগোচরেই আছে।

তিনি দ্যুগের-এর স্ত্রীকে বললেন, 'দেখুন মাদাম, আজ পর্য্যন্ত আমাদের যা লব্ধজ্ঞান আছে তা' থেকে বলা যায় আলো এবং লেন্স দিয়ে তৈরী ছবিকে এখনই চিরস্থায়ী করা যাচ্ছে না; কিন্তু একথাও ভাবা ঠিক হবে না যে আগামী কোনোদিন এটা করা অসম্ভব। অতএব যিনি এটা করতে চাইছেন তাঁকে পাগল ভাবা ঠিক নয়'। প্রফেসর দ্যুমা মিসেস দ্যুগেরকে শুধু শান্ত করার জন্য একথা বলেননি, তিনি বুঝেছিলেন আলো এবং লেন্স-এর সাহায্যে তোলা ছবিকে চিরস্থায়ী করতে পারার দিন আর বেশি দূরে নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিখ্যাত বৃটিশ মৃৎশিল্পী যোশিয়া ওয়েজউড-এর ছোটো ছেলে যোশেফ ওয়েজউড (Joseph Wedgewood) একই রকম ভাবে ইমেজকে স্থায়ী করার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু বিভ্রান্তিকর ফল হচ্ছিল। তাঁর ক্যামেরা অবস্কুরা-র সাহায্যে ইমেজ সৃষ্টির চেষ্টার ফল এতটাই খারাপ হল যে তিনি কেবলমাত্র পাতা, পতঙ্গের পাখা ইত্যাদি সিলভার নাইট্রেট সেনসিটাইজড্ কাগজ অথবা চামড়ার ওপর রেখে সূর্য্যের আলোতে তাদের শিল্যুট (silhouttes) ছবি করতে থাকলেন। প্রফেসর শ্যুল্‌ৎজ-এর মতো তিনিও নেগেটিভ ইমেজ পেলেন। এই নেগেটিভ ইমেজকে স্থায়ী করার তাঁর অনেক চেষ্টা কিছুতেই ফলবতী হল না। যত কমই হোকনা, একটু আলো লাগলেই ছবি নষ্ট হয়ে যেত।

শ্যুল্‌ৎজ এবং ওয়েজউড দুজনেই কিন্তু ঠিক রাস্তাতে-ই চলছিলেন। এঁরা সিলভার এ্যাটম্ মিশ্রণের কেলাসিত হওয়া এবং তার কেলাসিত অবস্থায় অলোক সংবেদী হওয়ার ক্ষমতার কথা তাঁরা জানতে পেরেছিলেন।

আলোকচিত্রের সেকাল ও একাল

ধ্রুব দত্ত
A.FIAP; Hon.F.Cos.

বলতে গেলে গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকেই আলোকচিত্রের সঙ্গে আমার পরিচয়, আর তথাকথিত আলোকচিত্রশিল্পের সঙ্গে সত্তরের দশক থেকে। এ সবই হয়েছিল ফিল্মের আর তা থেকে প্রস্তুত প্রিন্টের মাধ্যমে। কিছু বইয়ের ভূমিকার কথা আর বিভিন্ন গুণীজনের কাছে ফটোগ্রাফিবিষয়ক পাঠও এই প্রসঙ্গে অনস্বীকার্য।

সে সময়ে যেসব ক্যামেরা ব্যবহার করেছিলাম বা ব্যবহার হতে দেখেছিলাম, তা সবই ছিল ফিল্ম কেন্দ্রিক—১২০, ৬২০ বা ৩৫ মিমি। আর ক্যামেরাও ছিল নানারকমের—একেকটায় ব্যবহার হতো একেক সাইজের ফিল্মফ্রেম। ফিল্ম ডেভেলপারও ছিল নানা গুণাগুণের। গোড়ার দিকের ফটোগ্রাফিক প্লেট বা প্লেট ক্যামেরা তখন প্রায় ইতিহাস!

ফিল্মের খুঁটিনাটি বা ক্যামেরা তথা লেন্সের উৎকর্ষ বা ক্ষমতা সম্বন্ধে বোধ-বুদ্ধি আসতে শুরু করল ধীরে ধীরে। মোটামুটি একটা ধ্যান-ধারণা তৈরী হতে হতে চলে গেলো একটা যুগ। কী পেয়েছি। কতদূর শিখেছি যাচাই করতে ছবির সমালোচনা যেচে বেড়াই বিভিন্ন মানুষজনের কাছে, আর ছবিও পাঠাই বিভিন্ন স্যালোনে—দেশে বিদেশে। আবার পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের অন্যান্য আলোকচিত্রশিল্পীদের সৃষ্ট চিত্রাবলীও দেখি সুযোগ পেলেই।

ইতিমধ্যে বিদেশের কিছু ছবি চোখে পড়তে লাগলো, যেগুলো একটু যেন অন্যরকমের—হয়তো ক্যামেরা আর ডার্করুম টেকনিক ছাড়াও আর কিছু আছে! দেখতে দেখতে এখানকার বাজারেও এসে গেলো ডিজিটাল ক্যামেরা। অনেকের হাতেই দেখা যেতে লাগলো সেই ক্যামেরা বিভিন্ন মডেলের। প্রথমটায় ছিলাম সন্দিগ্ধ—তারপর সেরকম একটা ডিজিটাল ক্যামেরা হাতে নিলাম তুলে। উল্লেখ্য যে এখন অনেক ইলেকট্রনিক গ্যাজেট নির্মানকারীদেরও দেখা যাচ্ছে ডিজিটাল ক্যামেরার আঙিনায়।

আলোকচিত্রশিল্পের দিক থেকে দেখতে গেলে এই শিল্পের দুটি প্রধান স্তম্ভ—একটা শিল্পের দিক আর অন্যটা টেকনিকাল দিক। এখনও, শিল্পগত দিক তো প্রায় একই রকম আছে—যেমন ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা ইত্যাদি সবার মধ্যে থাকে। কিন্তু টেকনিকাল দিক থেকে দেখতে গেলে ফিল্মের আসনে ডিজিটাল পদ্ধতিকে বসানো যেন এক আকাশ-পাতাল পার্থক্যেরই অনুরূপ।

এখনকার ডিজিটাল ক্যামেরাগুলি আগেকার ক্যামেরাগুলিরই উত্তরসূরী মনে হলেও, ঠিক তা নয়। বহিরঙ্গ কিছুটা একরকম হলেও অন্তরঙ্গ আদপে তা নয়। আবার কোনও কোনও ডিজিটাল ক্যামেরা দেখতে একেবারেই ভিন্ন ধরণের। ব্যবহারের পদ্ধতিও অনেকাংশে একেবারেই আলাদা।

আগেকার ক্যামেরায়, ফিল্মেই ধরা পড়তো বিষয়বস্তুর ছবি, নতুন ফ্রেমে আবার নতুন ছবি তোলার সুযোগ। ফিল্ম সরে সরে যায়, ওয়াইনড করলেই। এস.এল.আর. ক্যামেরায় লেন্স বদল করলেও ছবির ক্ষতি হয় না। কিন্তু ডিজিটাল ক্যামেরার বেলায় তা বলা যায় না। সেখানে ফিল্মের জায়গায় এসেছে সেন্সর, বিভিন্ন মাপের সি.সি.ডি. বা সি.এম.ও.এস. জাতের, সে কিন্তু স্থির হিমালয় পর্বতের মতো—স্রোতস্বিনী ফিল্মের মতো সে গতিশীল নয়। লেন্স পরিবর্তনের সময় ধূলো তার অঙ্গের ভূষণ হয়ে পড়লে মুস্কিল! তাই লেন্স বদলাতে গেলেই ভাবতে হয়—ধূলো ঢুকে পড়বে না তো? তাহলে তো ছবির কোয়ালিটি গেলো! ক্যামেরা ও লেন্স কেনার সময় তাই দশবার ভাবতে হয় কী কিনবো বা কী কী কিনবো।

ফিল্ম-ক্যামেরা কথাটি চয়ন করেছি ডিজিটাল-ক্যামেরা থেকে আলাদা করার জন্যে, নইলে 'ফিল্ম-ক্যামেরা' বা

'অ্যানালগ-ক্যামেরা' কথার খুব-একটা প্রচলন ছিল না আগে। ফিল্ম-ক্যামেরায় ছবি তোলার জন্য শাটার টেপা থেকে আরম্ভ করে প্রিন্ট দেখা পর্যন্ত বেশ কিছুটা সময় চলে যায়—নিম্নতম একটা সময় তো লাগেই—তা একঘন্টাও হতে পারে, এক মাস বা আর কিছুও হতে পারে। কোথাও ছবি পাঠাতে হলে তুলনামূলকভাবে লাগে আরও বেশি সময়। কিন্তু ডিজিটাল ক্যামেরার বেলায় একথা খাটে না, কারণ নিয়ন্ত্রণ অনেকখানিই হাতের মুঠোয়। শাটার প্রেস করার পর মুহূর্তেই এসবকিছু করা যেতেই পারে। সিডি, টেলিফোন ইত্যাদি নতুন নতুন মাধ্যম ডিজিটাল ক্যামেরার কমুনিকেটর হিসেবে কাজ করতে পারে।

আগেকার ক্যামেরায় ফোকাস, অ্যাপারচার, শাটার স্পীড, ফিল্ম স্পীড ইত্যাদি গোটাকয়েক বিষয়ে সড়গড় হতে পারলে ছবি তো অবধারিত। আর এইসঙ্গে শিল্পবোধ সম্পৃক্ত করতে পারলে স্যালোন অবধি ছবির বিস্তার তো করাই যায়। ডার্করুমে ছবিকে দৃষ্টিনন্দন বা নান্দনিক দিক থেকে উন্নত করে তোলার জন্য নানারকম টেকনিক তো আয়ত্ত করতে হয়ই।

কিন্তু ডিজিটাল যুগে আরও কিছু নতুন জিনিষ এসেছে সেসবের জায়গায়—তার মধ্যে রয়েছে নানারকম ডিজিটাল ক্যামেরা নানা পিক্সেলের, কম্পিউটার, ফটোশপ ইত্যাদি। তাই প্রয়োজন সেগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া ও সেগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করা। ফটোশপের মাধ্যমে বা বিভিন্ন সফটওয়ারের মাধ্যমে ছবিতে নতুন মাত্রা যোগ করা আজ মুহূর্তের ব্যাপার, ডার্করুমের বদ্ধ ঘরে ঘন্টার পর ঘন্টা অতিবাহিত করার জায়গায়।

ডিজিটাল ক্যামেরার বেলায় শাটার টেপা নিজের হাতের ব্যাপার হলেও, ছবি প্রিন্টে রূপান্তরিত করার অনেকখানিই নিজের আর আয়ত্তাধীন নয়। একজন অলোকচিত্রশিল্পী আগে বলতে পারতেন আলোকচিত্রের পুরোটাই তাঁর সৃষ্টি—তা সে ভালো বা মন্দ যাই হোক। কিন্তু ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে কোনও ছবি পুরোটাই আলোকচিত্রশিল্পীর সৃষ্টি—সেকথা বলা যাবে কিনা, প্রশ্ন রয়েই যায়।

তাছাড়া, ছবির রেজোলিউশান নিয়ে খঁতখুঁতুনি ব্যাপারটি আছে। হাই-এণ্ড কিছু নামী-দামী ডিজিটাল ক্যামেরা বাদ দিলে ফিল্মে লভ্য রেজোলিউশন সাধারণ ডিজিটালে পাওয়া যাবে কিনা—এ সংশয় কাটতে চায় না। এখনও হয়তো আরও পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে।

ছবি দেখার ক্ষেত্রেও এসেছে বিপ্লব। আগে 15" x 12" বা তদরূপ কোনও মাপের প্রিন্টই ছিল ছবি বিচারের মানদণ্ড। কিন্তু সে জায়গায় এসেছে ডিজিটাল প্রোজেক্টর বা পাওয়ার পয়েন্ট—যেখানে ছবিকে দেখায় স্লাইডের মতো। তাই ছবি বিচারেও এসেছে পরিবর্তন। অ্যানালগ ক্যামেরা আর ডিজিটাল পদ্ধতিতে করা ছবি একসাথে বিচার করার বিষয়টিও তাই চিন্তার অপেক্ষা রাখে।

আলোকচিত্রশিল্পের প্রথমযুগে কোনও ফটোগ্রাফিক অনারের বালাই ছিল না। কিন্তু পরে নানান আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে ওঠে—যেমন, এফ.আই.এ.পি., অর পি.এস. বা পি.এস.এ.। এ ছাড়াও আছে নানা প্রতিষ্ঠান ও ক্লাব। এদের দেওয়া নানান সাম্মানিক প্রতীক আলোকচিত্রশিল্পীর কাম্য হলেও অনেক আলোকচিত্রশিল্পী ছিলেন ও আছেন যাঁরা ফটোগ্রাফিচর্চা করে যান এঁদের দেওয়া সাম্মানিক ভূষণ ব্যতিরেকেই। এই পরিস্থিতি আগেও ছিল, এখনও আছে। অনেক গুনী শিল্পী স্যালোনে ছবি পাঠাতেও আগ্রহী নন—নিজের সৃষ্টিতে নিজেই হয়ে থাকেন তন্ময় কিংবা ক্ষুদ্র মহলে ছবি দেখিয়েই ক্ষান্ত।

একথা তো মানতে হবে যে পরিবর্তন আসবেই। আগেকার ক্যামেরা, ফিল্ম, ফটোগ্রাফিক প্রিন্টিং পেপার ইত্যাদি ক্রমশই হয়ে যাচ্ছে দুর্লভ। পক্ষান্তরে ডিজিটাল প্রযুক্তি দরজায় কড়া নাড়ছে। এক্ষেত্রে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাটাই শ্রেয়। এরই মধ্যে উজাড় করে দিতে হবে নিজের সৃজনশীলতা।

একথা মনে রাখতে হবে, প্রযুক্তির বদল হলেও শিল্পের বদল তো হয়নি, তার বিচারে চিত্রের তো উত্তীর্ণ হওয়া চাই—তা সে যে মাধ্যমেই তৈরী হোক না কেন। লাবণ্যের বিচারই শেষ কথা—'শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ'।

গল্পের ছবি, ছবির গল্প

গৌতম মিত্র
Diploma in Photography

'চলো এবার ছুটিতে কোথাও বেড়িয়ে আসি, অনেকদিন কোথাও যাওয়া হয়নি।'

মেজদার এই প্রস্তাবে বাড়ির বড় থেকে ছোটো সবাই হইচই করে উঠলো। চল্ল প্রস্তুতি, টিকিট কাটা, হোটেল বুকিং করা, ছুটি ছাটা নেওয়া ইত্যাদি। প্রাথমিক কাজ সারা হলে যোগাড় যন্ত্র, মাল-পত্র গুছানোর ব্যাপারে সবাইকে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হোলো। অন্য সময় যারা কুঁড়ে এখন তারা বেড়ানোর উৎসাহে দ্বিগুণ উদ্দমে লেগে পড়লো কাজে।

ক্রমশঃ যাবার দিন এগিয়ে এলো। সকাল থেকেই বাড়িতে তোড়জোড়, হৈ চৈ। সব কিছু ঠিক ঠাক নেওয়া হল কিনা তার হিসাবপত্র চলছে। পানের ডিবে, ওষুধের বাক্স, ছুঁচ সুতো, রবারের চটি, গামছা, দাঁত খোঁচার কাঠি থেকে কাঁচি, নাইলনের দড়ি থেকে একটু গঙ্গাজল পর্য্যন্ত যখন মিলিয়ে নিয়ে সবাই একটু জিরোচ্ছে ঠিক এমন সময়, ছোটকার উক্তি, 'ওই যা, ক্যামেরাটা নেওয়া হয়নি তো', সবার চোখ গোল হয়ে গেলো এই শুনে যেন একটা দারুন রান্না করে তাতে নুন দিতে ভুলে যাওয়ার মতো অবস্থা।

বড়দা তার স্বভাব মতো গম্ভীর গলায় বলল, তবু যাওয়ার আগে তোর মনে পড়লো, 'তবে এখন তো আর ফিল্ম পাবি না আজ রোববার সমস্ত দোকান বন্ধ'। ঠিক এইখানটা থেকেই আমার মূল লেখার শুরু। আসলে উপরের গল্পটা লেখা নেহাৎই উদাহরণের জন্য। এটা বোঝাতে যে ফটোগ্রাফী আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আজ ঠিক কতটা জায়গা করে নিতে পেরেছে।

আরও একটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় কাহিনীটা।

বড়দার মন্তব্য শুনে ছোটরা মুচকি হাসলো। কেবল সেজদাই অন্য দিকে তাকিয়ে বলল 'তুমি এও জানো না, এখনকার ক্যামেরায় ফিল্ম লাগে না।'

শুনে বড়দা একটু থতমত খেল। বলে বসল 'মেলা ইয়ার্কি করিস না'।

এবার ছোটরা চেঁচিয়ে হেসে উঠলো ও তাদের ভেতর থেকেই কেউ বলে উঠলো 'এখন তো ডিজিটাল ক্যামেরা। এতে ওসবের বালাই নেই।'

এইখানটায় এসেই একটা বিবর্তনের ইতিহাস পেয়ে গেলাম।

একসময় ক্যামেরা আকৃতিতে ও ওজনে অনেক বড়ো ছিল। নাড়াচড়া করা সহজসাধ্য ছিল না। সে সব অবশ্য আমরা দেখিনি। পড়েছি।

আমরা যখন দেখলাম তখন ক্যামেরা দিব্যি গলায় ঝোলে। ঝুলে একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব তৈরী করে। সবাই ওই জটিল যন্ত্রটা চালাতে পারে না। একটা বিশেষ শিক্ষা ও দক্ষতা লাগে চালাতে। আবার এমনই মজা যে এই দক্ষতা অর্জনের কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই।

তাহলে উপায়? উপায়ও ছিল। গুরু ধরা। বিদেশি পত্র পত্রিকা পড়া। যারা বেশি জানে-তাদের পিছনে লেগে থেকে কিছু টিপস যোগাড় করা। এই পর্য্যন্তই।

চলছিল ভালোই। কিন্তু হঠাৎ করে একটা ঝড় উঠল। বিপন্ন এলোমেলো করে দিল এতদিনের লালিত ভাবনার জগৎ। এসে গেল ডিজিটাল যুগ।

রহস্যে, রোমাঞ্চে এও এক অপ্রতিদ্বন্দী বর্তমান সময়ে। ডার্করুম হয়ে গেল কমপিউটার। ফিল্ম লুপ্ত হল। এল CMOS, CCD-র মতো অজানা শব্দ। এল Megapixel, Photoshop, White Balance, Crop factor, এর মতো রহস্যময় বিষয়।

তবে কোন রহস্যই মানুষের কাছে অজানা থাকে না। দ্রুত নিজের জায়গা স্থায়ী করে নিল এই জগতে। ফটোগ্রাফাররাও এই ব্যাবস্থায় দ্রুত রপ্ত করে নিচ্ছে

নিজেদের।

অনেক উন্নতমানের কাজ হচ্ছে। প্রিন্টিংএর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বেশ একটা ইতিবাচক দিকে এগিয়ে চলেছে ফটোগ্রাফি।

পূজোর প্যান্ডাল থেকে বই মেলায়, পাড়ার ফাংশন থেকে স্কুলের স্পোর্টস সর্বত্রই হাত উঁচু করে দেখা যাচ্ছে মানুষজনকে মোবাইলে ছবি তুলতে। স্মৃতিকে স্থায়ী করে রাখার এক দুর্দম প্রচেষ্টা। যে মাসিমা মেশোমশাই এতোদিন শুধু ছবির জন্য পোজ দিতো তারা নিজেরাই এখন নাতি নাতনির ছবি তুলে Orkut-এ, Face Book-এ Upload করছেন।

কেউ কেউ এখনও এই এগিয়ে যাবার সময়ে একটু পেছিয়ে পড়ছে। কিছুটা অতীতের স্মৃতি আঁকড়ে কিছুটা গোঁড়ামিতে জড়িয়ে। তবে সময়ের, প্রযুক্তির অগ্রগতি তাদের জন্য তো থমকে যাবে না সে এগিয়েই যাবে। আশা রাখবো তারাও একদিন প্রগতির এই স্রোতে ভেসে পড়বে।

এভাবেই কিছুটা রহস্যাবৃত জগতের দরজা এখন দুহাট হয়ে খুলে গেছে সবার জন্য। সবাই এগিয়ে আসুক। আরো ভালো ছবি উঠুক। আরও নতুন নতুন জানলা খুলে গিয়ে আলোকিত করুক সমস্ত অন্ধকার কোণ।

আলোকচিত্রের কথকতা

প্রণব কুমার রায়
F.FIP; A.RPS; E.FIAP.

আধুনিক জগতের দৈনন্দিন জীবন আলোকচিত্রের মাধ্যম ব্যতীত অচল। আজ আলোকচিত্রের দৌলতে সারা বিশ্বই আমাদের চোখের সামনে ধরা দিচ্ছে। আপন ঘরে বসে বিশ্বের কোথায় কি ঘটছে তা শুধু কানে শোনা নয়, একেবারে চোখে দেখতে পাচ্ছি আলোকচিত্রের মারফত। নতুবা নিজের চোখে দেখা অঞ্চলটুকু ছাড়া অন্য জায়গার দৃশ্যাবলীর বর্ণনা ভিন্ন আর কিছুই জানা যেত না। বর্তমান সভ্যসমাজে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অলোকচিত্রের স্থান খুবই গুরুত্বপুর্ণ। একটা ভালো ছবি হাজার কথা বলে। এ কারণেই আলোকচিত্রকে বিশ্বজনীন ভাষা বলা হয়ে থাকে। আলো ছাড়া এবং ধরার কৌশল আবিষ্কারকদের মধ্যে মিঃ জে.এন.নিপসের নাম খুবই উল্লেখযোগ্য। ১৮১৬ সালে প্রথম সফল ক্যামেরা ইমেজ ধরার পর বিভিন্ন আবিষ্কারকদের প্রচেষ্টায় আলোকচিত্র সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলল উন্নতির শীর্ষে। শুরু হল সৃজনশীল আলোকচিত্রীদের নিজ নিজ কল্পনাকে চিত্রায়িত করার প্রবল প্রচেষ্টা। কিন্তু এখনও প্রয়োজনীয় রসায়নিক বস্তু এবং উন্নত প্রযুক্তির খামতি থাকায় আলোকচিত্রীগণ তাদের নিজেদের ইচ্ছা, আবেগ ও অনুভূতিকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। তাই ১৮৫২ সালে মি. এইচ বেয়ার্ড নামে একজন অলোকচিত্রী ল্যান্ডস্কেপে আকাশের এবং ভূমির জন্য আলাদা আলাদা দুটো নেগেটিভ তুলে একত্রিত করে একটি ছবি তৈরী করেছিলেন। নতুবা আকাশের বর্ণ বেশি উজ্জ্বল হত। ১৮৫৭ সালে মি. ও.জি. রাজল্যাণ্ডার নামে একজন আলোকচিত্রী ৩২ টি কাঁচের নেগেটিভ এর অংশ নিয়ে নিজের কল্পনা মাফিক 'দি ট্যু ওয়েজ অব লাইফ' নামক একটি ছবি তৈরী করেন। সেই সময় একাধিক নেগেটিভের সাহায্যে তৈরি ছবি সমূহ 'হাই আর্ট' রূপে স্বীকৃত হত। এ জাতীয় একটি ছবি তৈরীর পেছনে আলোকচিত্রীকে কতদিনের চিন্তা, ভাবনা, পরিশ্রম এবং খরচের চাপ সইতে হতো তা আজ ডিজিটাল ফটোগ্রাফির যুগে অনেক আলোকচিত্রী কল্পনাই করতে পারবেন না। ধীরে ধীরে কিছুদিনের ভেতরই নানা প্রচারপত্রেও আলোকচিত্রে ব্যবহার শুরু হলো। ১৮৬২ সনে নিউ ইয়র্ক শহর থেকে প্রকাশিত 'হারপার্স উইকলি' নামক কাগজে প্রেসিডেন্ট 'এব্রাহাম লিঙ্কন' এর ছবি প্রচারিত হয়েছিল। এভাবেই আলোকচিত্র তার জন্মলগ্নের কিছুদিন পর থেকেই ফটো জার্নালিজমেরও অপরিহার্য্য অঙ্গ হবার পথে অগ্রসর হল।

তারও কিছুকাল পর ১৯২০-৩০ সালে আলোকচিত্রে দেখা গেল অতিবাস্তববাদের প্রয়োগ। কিছু আলোকচিত্রী তাদের অবচেতন মনের কল্পনা বা কোনও দৃশ্যমান বস্তুকে নিজের কল্পনানুসারে সাজিয়ে ছবি করা শুরু করলেন।

অপরদিকে আলোছায়া ধরার যন্ত্রটিরও ব্যাপক উন্নতি শুরু হল। ১৯২০-৫০ সালের মধ্যে ক্যামেরা নির্মাণের ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হল। এই সময়টাকে ক্যামেরা নির্মাণের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়। আগেকার নক্শার আমূল পরিবর্ত্তন করে ক্যামেরার আকার-আকৃতি গঠন এবং ব্যাবহার প্রণালীতে নতুন ধারার প্রবর্তন করা হয়। ক্যামেরাকে আকৃতিতে ছোটো, ওজনে হাল্কা এবং তার ব্যাবহার প্রণালীকে সহজতর করা হল। পেশাদার, অপেশাদার এবং শৌখিন আলোকচিত্রীদের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য নানা রকম ক্যামেরা তৈরী হল যাতে ক্রেতারা তাদের নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কিনতে পারেন। ফলে সাধারণের মধ্যে ক্যামেরা কিনে ছবি তোলার প্রবণতা ভীষণভাবে বেড়ে গেল। অপেশাদার (অর্থাৎ এ্যামেচার) আলোক-চিত্রীগনের উৎসাহের দরুন আলোকচিত্র শিল্প খুব দ্রুত প্রসার লাভ করল। সারা বিশ্বেই এ্যামেচার আলোকচিত্রীগন

এক একটা সংগঠন তৈরী করে মাঝে মাঝেই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করায় ধীরে ধীরে জনসাধারণের মধ্যে ছবি তোলা এবং দেখার প্রতি অদম্য উৎসাহের সৃষ্টি হল। এ জাতীয় ক্লাব বা সংগঠন তৈরী করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা কিন্তু আলোকচিত্রের প্রায় জন্মলগ্নেই হয়েছিল। ১৮৫১ সালে ইংল্যাণ্ডের 'হাইড পার্কে' সর্বপ্রথম এ জাতীয় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আলোকচিত্রকে শিল্পকলা, বিজ্ঞান এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রের প্রতিভূ হিসাবে স্বীকৃতির উদ্দেশ্য নিয়ে যে প্রদর্শনীর শুরু হয়েছিল দর্শকদের প্রভূত সাড়া মেলায় এর উদ্দেশ্য প্রকৃষ্টরূপেই সাধিত হল। পরের বছরই ৭০০র বেশি ছবি নিয়ে মি. ফোটনের ব্যবস্থাপনায় আবার প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত হল। এই প্রদর্শনী যে শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যেই সাড়া জাগিয়েছিল তা নয়, মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং যুবরাজ চার্লসও সেখানে হাজির হয়েছিলেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আলোকচিত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল আজ তা সফল। সারা বিশ্বেই শিল্পকলা, বিজ্ঞান, এবং বাণিজ্যিক জগতে তার অবাধ বিচরণ। আজ শুধু আলোকচিত্রী নয়, আজ প্রায় প্রতিটি লোকের পকেটেই ক্যামেরার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আজ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের সর্বত্রই আলোকচিত্রের অবাধ বিচরণ। তাঁবুর মধ্যে যার জন্ম ক্যামেরা নামক সেই যন্ত্রটি আজ যেমন লোকের পকেটে পকেটে ঘুরছে তেমনই দূরভাষেও সে আস্তানা গেড়েছে।

আলোকচিত্রের বিচার

সুধাময় ঘোষাল
A.FIAP; Hon.F.Cos.

দৈনন্দিন জীবনে আলোকচিত্রের প্রয়োজনীয়তা নতুন করে কারোকে বোঝানোর দরকার হয়না। আলোকচিত্র আবিস্কারের শুভক্ষণ থেকেই মানুষের ছবির প্রতি আগ্রহ ক্রমশই বেড়েছে। আমরা সকলে ছবি ভালোবাসি এবং সেই কারণে ছবি তুলতে প্রবল আগ্রহে এগিয়ে যাই। ছবি তোলার পর ছবি দেখার আনন্দে মেতে উঠি। ছবি তোলা এবং পরিমার্জনার পর সব ছবিই উচ্চমানের হয়েছে, এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ছবি যারা বোঝেন, নান্দনিক উৎকর্ষতা নিয়ে মাথা ঘামান অথবা ছবির সমালোচকরা হয়ত বলবেন, তোলা ছবিগুলির মধ্যে কোনটাই গ্রহণযোগ্য নয়। এমন কেন হলো, তা হয়ত সাধারণ মানুষ বুঝে উঠতে পারেন না। তাঁরা তো অতি যত্ন সহকারে ছবি তুলেছেন উচ্চমানের ক্যামেরার সাহায্যে ব্যর্থ হওয়ার তো কোন কারণ নেই।

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বা বড়ো বড়ো শহরে বহু ফোটোগাফিক সোসাইটি আছে, যাদের সদস্যরা অবিরাম পরিশ্রম করে চলেছেন ফোটোগ্রাফির উন্নতির জন্য এবং অন্তরিক লক্ষ্য রাখছেন আলোকচিত্রের নান্দনিক মান যেন অন্যান্য দেশের তুলনায় তাদের দেশে শীর্ষে থাকে। অধিকাংশ দেশেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় থেকে আন্তর্জাতিকের মান অনেক উন্নত থাকে। আমাদের দেশেও হয়। এইসব প্রদর্শনী দেখলেই বোঝা যায় যে আজকের দিনে আলোকচিত্রের মান বা উৎকর্ষ আর্টের কোন পর্যায়ে উন্নিত হয়েছে। সাধারণতঃ ঐসব প্রদর্শনীতে একটা বিশাল সংখ্যায় প্রাপ্ত ছবির মধ্যে ২০০/২৫০টা ছবি বেছে নিয়ে প্রদর্শনী কক্ষে টাঙানো হয় সাধারণের কাছে প্রদর্শনের জন্যে। এখন সাধারণ মানুষের মনে একটা প্রশ্ন আসতেই পারে যে কি ভাবে বা কি পদ্ধতিতে এই বিপুল সংখ্যক ছবির মধ্যে থেকে প্রদর্শনীর জন্যে নির্দিষ্ট ছবিগুলো গ্রহণ করা হয়। আলোকচিত্র বিচারের জন্যে যে সব বিচারক বা জুরি আছেন, তাঁরা সমস্ত প্রাপ্ত ছবিগুলোকে নানান বিষয়ের ওপর দৃষ্টি, গুণগতমান বজায় আছে কিনা এবং গ্যালারীর ছবি টাঙানোর জায়গার দিকে নজর রেখে বেছে দেন। তাঁরা সাধারণতঃ যে সব পদ্ধতি গ্রহণ করেন তা এক এক দেশে এক এক ধরণের হয়ে থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে একটা প্রদর্শনীর জন্যে যে সমস্ত ছবি আসে, বিচারের মাধ্যমে সেই বিপুল সংখ্যাকে কমিয়ে আনা হয় প্রদর্শনী-কক্ষ অনুযায়ী। বিভিন্ন দেশে এই কমিয়ে আনা সংখ্যাটা কক্ষ অনুযায়ী তফাৎ হয় অথবা গুণগতমানের দিকে লক্ষ্য রেখে কমিয়ে আনা হয়। ভালো ছবি বাছাই এর জন্যে বিচারকমণ্ডলীকে কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। সেই পদ্ধতি অন্য দেশের সঙ্গে না মিলতেও পারে। এমন কি একই দেশের মধ্যে বিভিন্ন শহরে বিভিন্ন রকম পদ্ধতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। কিন্তু এটা নিশ্চিত যেকোনও বিচারকই ছবি বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ছবির সৃজনশীলতার সঙ্গে কোনও ভাবেই আপোষ করেন না। এই সব পদ্ধতিগুলো নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। কিন্তু তার আগে সংখ্যায় বিচারকরা ক'জন থাকেন অথবা স্যালোঁ কর্তৃপক্ষ প্যানেলে ক'জন বিচারক রাখেন এবং বিচারকরা গুণগত মানের দিকে নজর রাখতে গেলে কোন কোন বিষয়ের ওপর লক্ষ্য রাখেন তা জানা দরকার।

বিচারকমণ্ডলী সংখ্যায় সর্বদাই বিজোড় থাকেন—, যথা ১, ৩, ৫, ৭, ৯ ইত্যাদি, যাতে প্রদর্শনীর জন্য প্রাপ্ত প্রতিটা ছবিই সুবিচার পায়। প্রদর্শনীর ছবিগুলো শৈল্পিক মান ও নান্দনিক উৎকর্ষ নিরুপণের জন্যে যে যে বিষয়ের ওপর গুরত্ব দেওয়া হয়। তা হলো—

১) প্রিন্ট কোয়ালিটি

২) কম্পোজিশন
৩) টেকনিকালিটিস্
৪) আপিল বা আবেদন
৫) থীম, ইত্যাদি

সিডনি সিস্টেম

একটা প্রদর্শনীর জন্যে যত ছবি পাওয়া যায় প্রত্যেকটা একক ভাবে টাঙানো হয় বিচারকমণ্ডলীর সামনে যথেষ্ট আলোর মধ্যে যাতে প্রতিটা ছবি আলাদা আলাদা ভাবে দেখে মার্কিং করা যায়। এই সিস্টেমে মার্কস দেওয়া হয়—১, ৩ বা ৫। প্রত্যেক বিচারক এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে একটা মার্কই দেবেন তার বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী এবং ছবির গুণগতমান কতটা রয়েছে বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে। একটা ছবিকে পাঁচ দেওয়ার অর্থ, সৃজনশীলতার দিক থেকে ছবিটা সার্থক এবং শিল্পী তাঁর কল্পনা ও নিজস্ব চিন্তা ভাবনাকে ফোটোগ্রাফির কলাকৌশলের সাহায্যে সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে ছবিটার শৈল্পিক উত্তরণ ঘটিয়েছেন। বিচারকের মতে ছবিটা গৃহীত এবং পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতা আছে। ছবিকে 'তিন' দেওয়ার অর্থ—অন্য বিচারকমণ্ডলীর আপত্তি না থাকলে প্রদর্শনীতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হোক। অন্য বিচারকরা যদি 'পাঁচ' দেন তবে অবশ্যই প্রদর্শিত হবে। আর 'এক' দেওয়ার অর্থ এ ছবি প্রদর্শিত হওয়া উচিত নয় অর্থাৎ যাঁরা ছবি প্রদর্শনে অনুপযুক্ত ভাববেন, অথবা নিম্নানের মনে করবেন তাঁরা প্রথমেই 'এক' দিয়ে প্রদর্শনীর বাইরে রাখবেন। সিডনি সিস্টেমের একটা অসুবিধের দিক—কোনও ছবিকে 'তিন' দিলে মনে হবে কম দেওয়া হলো অথচ 'পাঁচ' দিয়ে এ্যারার্ড গ্রুপে পাঠালে অনেক বেশী দেওয়া হয়। তিন বা পাঁচ এর মাঝামাঝি কিছু নেই।

পপুলার সিস্টেম

এক থেকে পাঁচ সবগুলো সংখ্যার এই পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ এক থেকে পাঁচ যে কোনও সংখ্যাকে ব্যবহার করা হয়। নিম্নরূপ ভাবে—

পাঁচ—এ্যায়ার্ড
চার—গৃহীত
তিন—অন্যান্য বিচরকদের আপত্তি না থাকলে অথবা বেশি সংখ্যা ব্যবহার কালে গৃহীত।
দুই এবং এক—গৃহীত নয়।

এই ভাবে সকলে বিচারকরা সমস্ত ছবিতে এক থেকে পাঁচ অবধি মার্কিং করেন এবং একটা ছবির প্রাপ্ত সকল সংখ্যা যোগ করে ছবিটা কত পেল তা দেখা হয়। প্রদর্শনী কক্ষে ছবি টাঙানোর জায়গা অনুযায়ী বেশি সংখ্যা পাওয়া ছবিগুলোকে আলাদা করে ফেলা হয়। বিতর্কিত ছবি বা অন্যান্য সমস্যায় বিচারকমণ্ডলী আলোচনার মাধ্যমে সব সময়েই যে কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেন এবং এক্ষেত্রে বৃহত্তর গোষ্ঠীর মত-ই সমাদৃত হবে। কিন্তু মার্কিং এর সময়ে ছবির প্রাপ্ত নম্বর গোপন রাখা হয়। এই গোপনীয়তা রক্ষার একমাত্র কারণ কোনও বিচারক অন্য কোনও বিচারকদের যাতে প্রভাবিত না করতে পারেন।

'এ' 'বি' 'সি' সিস্টেম

এটি খুবই জনপ্রিয় পদ্ধতি। বিচারকমণ্ডলীর সদস্যরা পরস্পরের মধ্যে খোলাখুলি আলাচনা করতে পারেন। কোন ছবিকে যদি 'এ' দেওয়া হয়, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে ছবিটি শিল্পশৈলীর উৎকর্ষ রক্ষা করে প্রদর্শনীর মান উন্নয়ন করবে এবং সেইজন্য বিচারক প্রদর্শনে ছাড়পত্র দিলেন। কোন ছবি 'বি' পেলে মনে করতে হবে এটা 'এ' প্রাপ্ত ছবির সমগ্রোত্র নয় কিন্তু অন্যান্য বিচারকরা যদি 'এ' দেন তাহলে প্রদর্শিত হতে পারে 'এ' গ্রুপের অন্তর্গত হয়ে। আর 'সি' দিলে প্রদর্শনের স্বীকৃতি নেই। এখন সমস্ত 'এ' 'বি' ও 'সি' পাওয়া ছবিগুলোকে আলাদা করতে হবে। কোনও বিচারকমণ্ডলীতে যদি তিনজন বিচারক থাকেন এবং দুজন বিচারক একটা ছবিকে 'এ' দেন এবং অপর বিচারক 'সি' দেন তাহলে ছবিটা দুটো 'এ' এবং একটা 'সি' পেল। আলোচনার মাধ্যমে যদি তৃতীয় বিচারক সম্মত হন তাহলে 'বি' কে 'এ' করে ছবিটাকে 'এ' গ্রুপে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে। এই ভাবে সমস্ত ছবিগুলো 'এ' 'বি' ও 'সি' তিনটে গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গেল। এখন ধরা যাক প্রদর্শনী কক্ষে দুশোটা ছবি টাঙানোর মতো জায়গা আছে এবং 'এ' ও 'বি' গ্রুপ মিলে যদি দুশো হয় তাহলে সেই ছবিগুলোই প্রদর্শিত হবে। বেশি হলে অলোচনার প্রয়োজন। আর দুশোর কম হলে শুধুমাত্র সেই ছবিগুলোই প্রদর্শিত হবে।

সাধারণতঃ একটা অনুমোদিত প্রদর্শনীতে ৫০০ থেকে

১০০০ ছবি আসে। নামী বিশাল আকারের প্রদর্শনীতে যেমন রয়াল ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অথবা বাৎসরিক লণ্ডন স্যালোতে আনুমানিক ৪০০০ থেকে ৬০০০ ছবি আসে। (১৯৯৯ সালের ৩৪তম ওয়ালর্ড প্রেস ফোটো প্রতিযোগীতায় ছবি এসেছিল ৪২,২১৫ সংখ্যায়। ১২২টা দেশের ৩৯৮১ জন ফোটোগ্রাফার যোগদান করেছিল)। ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ আমেরিকার অনুমোদন থাকলে পৃথিবীর ওই অঞ্চলের দেশগুলো প্রদর্শনীতে যোগদান করে এবং ছবির গুণগতমানকে সমৃদ্ধ করার সহায়ক হয়। আরো নানান পদ্ধতিতে ছবির বিচার হয়। প্রত্যেক পদ্ধতিতে কম বেশি কিছু না কিছু অসুবিধে থাকে। স্যালোঁ কর্তৃপক্ষ যেটা ভালো বোঝেন বিচারকমণ্ডলীর সাথে আলোচনা করেই ঠিক করেন। তবে পরিশেষে একটা কথা মনে রাখা খুবই প্রয়োজন যে বিচারকমণ্ডলী সর্বদাই চেষ্টা করেন যাতে প্রাপ্ত ছবিগুলোর মধ্যে থেকে নান্দনিক উৎকর্ষমণ্ডিত ছবিগুলোকে প্রদর্শনীতে স্থান দিতে।

আমাদের লক্ষ্য

১) আলোকচিত্র শিল্পকে সর্বজনগ্রাহী ও জনপ্রিয় করে তোলা।

২) নবীনদের আলোকচিত্র বিদ্যায় আগ্রহী করে তুলে তার সকল দিক সম্বন্ধে অবহিত করা।

৩) আলোকচিত্র বিষয়ে যে একটি শিক্ষাক্রম চালু করা হয়েছে তাকে সর্বস্তরে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

৪) প্রদর্শনীর মাধ্যমে সদস্যদের ছবি জনসমক্ষে তুলে ধরা।

৫) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আলোকচিত্র শিল্পীকে প্রতিষ্ঠা লাভে সাহায্য করা।

৬) বাংলা ভাষায় আলোকচিত্র সম্বন্ধে বই প্রকাশ করা।

৭) আন্তর্জাতিক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা।

৮) সমভাবাদর্শী আলোকচিত্র সমিতিগুলির মধ্যে ভাবের ও কাজের আদান প্রদান করা।

৯) আলোকচিত্রের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির নানা দিকগুলিকে অন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তুলে ধরা।

www.chhayapath.org

সম্পাদক অশোক কুমার সান্যাল A.FIP; A.FIAP. ছায়াপথ, ক্যালকাটা